Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-IV, July 2021, Page No.65-72
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ইতিহাসের দর্পণে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়'

অনিন্দিতা সাহা
গবেষিকা, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract:

History is a suspended form of atmospheric time that gains historicity in the future. Where there is a present, it must be admitted that there was once a kingdom of the past, which has remained in the record of time as history. When we stand in the 21st century and discuss history, we understand the former monarchies, empires, wars, or foreign invasions, independent countries, and so on. But apart from these, the history that can be written in gold letters can be understood by looking at the biographies of famous people of the past. Whether that person is bad or good, if he can become famous or infamous in the country-time-person by doing some special deed, he becomes the historical personality of the future and history is written about him. It is pertinent to note that when the tide of Western renaissance came in the arena of Indian poetry, fiction was born and history took place as an element there. Gradually in the twentieth century, Sunil Gangopadhyay, a famous novelist in the world of Bengali literature, wrote a novel on the history of Calcutta in the nineteenth century. The novel is based on the main character Kaliprasanna Singh of Calcutta in the nineteenth century and various events in his life. Although life is the main preoccupation in the novel, the conscious reader will soon realize that the metaphorical twist has served the author a desolate history in the novel. So in our current article we will try to show the duo of history and novel in the novel 'That Time'.

Key words: Nineteenth century, history, historical, novel, Kolkata.

সেই সময় বলতে আমরা সাধারণত কী বুঝি? আমরা বুঝে থাকি কোন এক বিগত সময়কে। সেই সময়টা পাঁচ-দশ-কুড়ি-পঞ্চাশ অথবা তার চাইতেও দীর্ঘমেয়াদী হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু এক শতাব্দী পূর্বের সময়কে ভাবতে সাধারণ মানুষের খানিকটা সময় লাগে বৈকি। তবে বিংশ শতাব্দীতে বসে অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ভেবেছিলেন উনিশ শতকের কথা, যার ফলশ্রুতি 'সেই সময়' উপন্যাস(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম প্রকাশ ১৯৮১ ও ১৯৮২ সাল)। বাংলা সাহিত্য জগতের ইয়ং বেঙ্গল দলের বিখ্যাত চরিত্র কালীপ্রসন্ন সিংহ ওরফে হুতম প্যাঁচার(১৮৪০-১৮৭০) জীবনকালকে কেন্দ্র করে নবজাগরণের জোয়ারের টানাপড়েনে কলকাতা নগরীর একাধারে অধঃপতিত রূপ ও অপরদিকে সমাজ সংস্কারমূলক উৎকৃষ্ট দিকটির ইতিহাসকে লেখক এই উপন্যাসে রূপদান করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের ইতিহাসের তথ্যকে ছাপিয়ে ওঠে জীবনরস। সেখানে ইতিহাসের তথ্য গৌণ,

সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের পরিকাঠামোই প্রধান। তাই আমরা 'সেই সময়' উপন্যাসে দেখি যে ঔপন্যাসিকের রচনাকৌশলে ইতিহাসও সেখানে 'নড়িয়া বেড়ায়'।

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দিলে বোঝা যাবে যে একজন সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে ইতিহাস ও উপন্যাসের মূল্য কতটুকু, যেমন – " ইতিহাসের সংশ্রবে উপন্যাসের একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোনো খাতির নাই।... লেখক ইতিহাসকে অখণ্ড রাখিয়াই চলুন আর খণ্ড করিয়াই রাখুন, সেই ঐতিহাসিক রসের অবতারণায় সফল হইলেই হইল"।[১] কিন্তু সিদ্ধরসের হানি ঘটলে তা দোষণীয়। কারণ সর্বজনবিদিত সত্যকে উলটো করে রচনা করলে তা পাঠকমনে আঘাত হানে এবং সেই সাহিত্য বিফলে যায়। আবার জনৈক সমালোচক ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যকেই উদ্ধৃত করেছেন- "... ইতিহাসের উদ্দেশ্যে কখন কখন উপনাস্যে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উপন্যাসে লেখক সর্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন"।[২] তাই ইতিহাসের উপাদান 'সেই সময়' উপন্যাসের পটভূমিকা আর সেই ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে দানা বেঁধেছে এর কাহিনি, যেখানে রয়েছে ঐতিহাসিক চরিত্র ও তাঁদের জীবনের সত্য ঘটনাবলী। ঔপন্যাসিকের মতে- "...উপন্যাস উপন্যাসই, ইতিহাস নয়, বলা বাহুল্য। ইতিহাসের সার্থকতা তথ্যনিষ্ঠায়, উপন্যাসের উপজীব্য হল তত্ত্ব এবং শিল্পরস"।[৩] এই তত্ত্ব এবং শিল্পরসকে বাহন করেই 'সেই সময়' উপন্যাসটি একটি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসে উত্তীর্ণ হয়েছে।

উপন্যাস হল সাহিতের সেই উপকরণ, যেখানে প্রকাশ পাবে একটি সময়ের বিবরণ এবং সময়ের হাত ধরাধরি করেই এগিয়ে যাবে তার কাহিনি। এই উপন্যাসের কাহিনিবৃত্ত গড়ে উঠেছে নায়ক নবীনকুমারের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে। কিন্তু তবুও উপন্যাসটি পড়তে গিয়ে পাঠকের একসময় মনে হতে পারে লেখক হয়তো নবীনকুমারকে ভুলে গিয়ে উনিশ শতকের শহর কলকাতার সামাজিক ইতিহাসের চিত্র আঁকতে বসেছেন। জনৈক সমালোচকের মতে- " 'সেই সময়' সন্দেহ নেই দুরন্ত সময়। উপন্যাসটি তারই জীবন্ত আলেখ্য। একদিকে শঠটা, ভণ্ডামি অ লাম্পট্যের রমরমা, অপরদিকে দেশ ও সমাজ সম্পর্কে নবচেতনার উন্মেষ। একদিকে বিধবাবিবাহ নারীশিক্ষার জন্য আন্দোলন, অন্যদিকে প্রাচীন গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রয়াস। একদিকে পায়রা ওড়ানো ও গণিকা বিলাস, অন্যদিকে শাস্ত্র ও ক্লাসিক গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রচার, একদিকে সাহেবিয়ানার অন্ধ অনুকরণ, অন্যদিকে শাশ্বত ভারতের অন্বেষণ"।[৪] এই উক্তির মধ্যেই ফুটে উঠেছে 'সেই সময়' উপন্যাসের কাহিনিবৃত্ত ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। এখানে আমরা ছাতুবাবুর মাঠে বুলবুলির লড়াইয়ের দৃশ্য যেভাবে দেখি অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়ন ও নারী শিক্ষার লড়াইও বিদ্যমান। একদিকে রয়েছে রামকমল সিংহ ও চণ্ডিকাপ্রসাদ মল্লিকের মতো হঠাৎ বাবুদের পানাসক্তি ও গণিকা প্রতিপালনের দৃশ্য, অপরদিকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মধর্মের প্রচার এবং একইসঙ্গে রাণী রাসমণির মতো গোঁড়া হিন্দু নারী চরিত্র, যেখানে- "...খৃষ্টানী এবং নিরাকার ব্রহ্মের পূজা, তাঁর দুই নয়নের বিষ। হিন্দু ধর্মের গৌরব তিনি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে যাবেনই"[৫] বলে পণ করেছেন। অর্থাৎ হিন্দুধর্মের উন্নতিকল্পের চিন্তা করছিলেন রানী রাসমণি। আবার একদিকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা নাটক' ও 'মেঘনাদবধ' কাব্যের রচনা, অপরদিকে হরিশচন্দ্র মুখার্জির নিরীহ নীলচাষীদের পক্ষ থেকে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে লড়াই। একইসঙ্গে নবীনকুমার তথা কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' ও প্যাঁরীচাঁদ মিত্রের আলালী ভাষায়

'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করে সমাজের বাবুদের প্রতি কটাক্ষ প্রদান তথা জনজাগরণের চেষ্টা আবার নবীনকুমার (কালীপ্রসন্ন সিংহ) কতৃক মহাভারত অনুবাদের মাধ্যমে ভারতীও ধর্ম-সংস্কার-ঐতিহ্যকে ধরে রাখার প্রচেষ্টা। এবং বলাই বাহুল্য যে এখানেই উপন্যাসটির কাহিনির ঐতিহাসিকতা প্রমাণিত।

উপন্যাসের কাহিনির বুনন নির্ভর করে চরিত্রের উপর। 'সেই সময়' উপন্যাসটি ঐতিহাসিকতার শিরোপা লাভ করার অপর কারণটি নিহিত আছে উপন্যাসের চরিত্রের উপরে। লেখক ইতিহাসের চরিত্রগুলোকে রূপক নামের আড়ালে উপন্যাসে অবিকৃত ভাবে উপস্থাপন করেছেন। সেই চরিত্র সম্বন্ধে ঔপন্যাসিকের মন্তব্য- "...উপন্যাসের চরিত্রগুলি কথা বলে এবং ঘুরে ফিরে বেড়ায়, কিন্তু ইতিহাস সংলাপের ধার ধারেনা, এবং জীবনী গ্রন্থগুলিতেও দু-চারটি টুকরো গল্প-ছাড়া জীবিত মানুষটির কীর্তিগুলির আক্ষরিক বর্ণনা থাকে না। সুতরাং যতদূর সম্ভব তথ্য আহরণ করে এঁদের জীবন্ত করার জন্য কল্পনাশ্রয়ী সংলাপ বহুল পরিমাণে ব্যাবহার করতে আমি বাধ্য হয়েছি।...তবে কোন ঐতিহাসিক চরিত্রকেই আমি স্বস্থান থেকে কিংবা জীবণপর্বের নির্দিষ্ট সময়গুলি থেকে বিচ্যুত করিনি"।[৬] তাই 'সেই সময়' উপন্যাসটির ঐতিহাসিকতা নির্ণয় করতে গেলে আমাদের মূলত কাহিনির চরিত্রগুলকে কেন্দ্র করেই আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অতএব লেখকের কথার উপরে ভিত্তি করে উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করাই সমীচীন হবে, যথা- (১) ঐতিহাসিক চরিত্র, (২) অনৈতিহাসিক চরিত্র, (৩) কল্পঐতিহাসিক চরিত্র। নিম্নে এই তিনটি গোষ্ঠীর চরিত্রাবলীর ঐতিহাসিক বর্ণনা করা হল-

(১) ঐতিহাসিক চরিত্র – এখানে উপন্যাসের ঐতিহাসিক ব্যাক্তিদের শুধুমাত্র নামোল্লেখ করা হবে, কেননা তাঁদের ঐতিহাসিক কর্মের বিস্তৃত বর্ণনা আমরা পরের দুই পর্যায়ে বিশ্লেষণ করবো। উপন্যাসের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি হল - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তাঁর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং তাঁর পিতামাতা রাজনারায়ণ দত্ত ও জাহ্নবী দেবী, গৌরদাস বসাক, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, রাধানাথ শিকদার, রাধাকান্ত দেব, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রানী রাসমণি, রাজনারায়ণ বসু, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালংকার, ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ডাক্তার গুডিব সাহেব, দীনবন্ধু মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যাঁরীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, অঘোরনাথ গুপ্ত, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বেথুন সাহেব, লং সাহেব, মঙ্গল পাণ্ডে, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, গদাধর/গদাই চট্টোপাধ্যায় (শ্রী রামকৃষ্ণ) প্রমুখ।

(২) অনৈতিহাসিক চরিত্র – ঐতিহাসিক উপন্যাসের সব চরিত্রই প্রধানত ঐতিহাসিক হয়। কিন্তু কখনো কখনো লেখক কাহিনির প্রয়োজনে কোন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সাধারণ দৃষ্টিতে কিছু অনৈতিহাসিক চরিত্র রচনা করে থাকেন। 'সেই সময়' উপন্যাসে আমরা এমন কয়েকটি চরিত্র পেয়ে থাকি যা উনিশ শতকের সমাজ জীবনের কিছু বিশেষ শ্রেণীর প্রতীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যেমন- রাইমহন ঘোষালের চরিত্রটি উপন্যাসে অনেক আকর্ষণীয়। ধনী বাবুদের তোষামোদ করে, কেচ্ছার প্রচার করে সে নিজের খাদ্য ও মদ্যের সংস্থান করে। আবার সুযোগ পেলে চুরি করতেও ছাড়েনা। তাঁকে তৎকালীন সমাজের দৃষ্টিতে মোসাহেব বলা চলে।

উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের জমিদারেরা বাবু হওয়ার আশায় কলকাতায় আসতেন। তাই- "মানিকগঞ্জের জমিদার পূর্ণচন্দ্র রায় যাবেন কলকাতা দর্শনে"।[৭] আর এই ধরণের বাবুদের বাগবাজারের ঘাটে

আপ্যায়নকারী- "মোসাহেব ও দালালরা সদ্য প্রত্যহ ছোঁক ছোঁক করে। এখান থেকেই বাবু পাকড়াতে হয়। তীর্থস্থানের পাণ্ডাদের মতন দালাল মোসাহেবরা কে আগে কোন বাবুকে পাকরাবে তা নিয়ে রীতিমতন প্রতিযোগিতা ও ধুন্ধুমার কাণ্ড চলে। বিশেষত বাঙাল দেশের বড়মানুষ দেখলে তাদের আমোদ আর ধরেনা। বাঙাল দেশের বড় মানুষেরা প্রত্যেকেই এক একটি যেন নধর পাঁঠা"।[৮] এই ধরণের জমিদারদের বাবু হিসেবে গড়ে তুলে তাকে শোষণ করতে করতে 'নন্দী ভৃঙ্গি'-র মতো মোসাহেবদের যখন মনে হতো- "এ ব্যাটা ছিবড়ে হয়ে গ্যাচে!"[৯] তখন তারা চলতো নতুন বাবুর সন্ধানে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তৎকালীণ সমাজে গণিকা প্রতিপালনও বিশেষ বাবুয়ানার অঙ্গিভুত ছিল। কমলাসুন্দরী, হীরেমণি, পদ্মবালার মতো চরিত্রগুলি উপন্যাসে তারই প্রতিভূ স্বরূপ।

নবজাগরণের সমাজ সম্পর্কে জনৈক সমালোচক বলেছেন- "... বিত্তকুলীন, বংশমর্যাদাশূন্য এইসব হঠাৎ নবাবদের রুচিবোধ ছিল অত্যন্ত স্থূল। তাঁরা বাইনাচ দেখতেন, ইয়ারবক্সী নিয়ে মদ-মাংস খেয়ে লাম্পট্য করতেন,... মিথ্যা বলে, প্রবঞ্চনা করে, উৎকোচ দিয়ে বা নিয়ে জাল-জুয়াচুরি যা হোক করে কিছু পয়সা করতে পারলেই, সমাজে যে কেউ হয়ে উঠত মান্যগণ্য বিশিষ্ট অর্থ যার- সম্মান তার, প্রতিপত্তি তার, সারা সমাজ তার পায়ের তলায়"।[১০] উপন্যাসে এই মন্তব্যের প্রতিনিধিত্ব করেছেন বৃদ্ধ জগাই মল্লিক ও তাঁর পুত্রেরা। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র চণ্ডিকাপ্রসাদ "... এক এক সময় সে ক্ষিপ্ত হয়ে পিতাকে মারতে যায় আর চিৎকার করে বলে, হারামজাদা বুড়ো, বলচি যে তোর ছেরাদ্দে দেশসুদ্ধ কাঁপিয়ে দেবো। তাও মরবিনি!"[১১]

তাছাড়া উপন্যাসে কোন কোন জায়গায় লেখক শহর কলকাতাকে ছাপিয়ে গ্রাম বাংলার বর্ণনা দিতে মুখর হয়ে উঠেছেন। সেখানে তিনি বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল ও নীলচাষের উপর। উপন্যাসে জমিদার ও তাঁদের নায়েব গোমস্তাদের অত্যাচারে গৃহহারা ভূমিহারা কৃষকেরা প্রতিনিধিত্ব করেছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শোষকদের। ত্রিলোচন দাস ও তার পরিবার এখানে তারই পরিচায়ক। অপরদিকে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার, 'শ্যামচাঁদ' (চাবুকের নাম, ইতিহাস সম্মত)- এর ভয় দেখিয়ে নীলচাষ আদায় করার বর্ণনাও উপন্যাসে বর্তমান। এখানে নীলকর সাহেবের ভূমিকায় রয়েছেন ম্যাকগ্রেগর ও পীড়িত প্রজার উদাহরণ হল তোরাপ চরিত্র।

(৩) কল্পঐতিহাসিক চরিত্র - 'সেই সময়' উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ইতিহাসের চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করে, নতুন ভাবে নামকরণ করে কাহিনিতে পরিবেশন করেছেন এমন অনেক চরিত্র রয়েছে। ধরা যাক উপন্যাসের মূল নায়ক চরিত্রের কথা। ঔপন্যাসিকের মতে- "এই কাহিনীর মূল নায়কের নাম 'সময়'"[১২]। তবুও নায়ক হিসেবে আমরা পাই নবীনকুমারকে। তিনি আরও বলেছেন- "... নবীনকুমারের চরিত্রে এক অকাল মৃত অসাধারণ ঐতিহাসিক যুবকের কিছুটা আদল আছে"[১৩]। এবং এই ঐতিহাসিক যুবকটি হলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। তথ্য থেকে জানা যায়- "Hutom Paychar Naksha is his immortal creation in witch portrayed the picture of the Kolkata. Sunil Gangapadhyay in his epoch making novel 'Sei Somoy'(Those Days), recreated the same period with Kaliprasanna as the symbolic character, his name in the novel being Nabinkumar".[১৪] তাছাড়া কল্পঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে রয়েছেন জগমোহন সরকার। ইতিহাসে প্যারীচরণ সরকারের- "উদ্যোগে ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'সুরাপান নিবারনী সভা'",[১৫] কিন্তু উপন্যাসে জগমোহন সরকারের নেতৃত্বে এই সভা গঠিত হয় এবং এখানেই এই কল্পঐতিহাসিক চরিত্রের ইতিহাস সম্মত সততা প্রমাণিত। একইসঙ্গে বিদ্যাসাগর কতৃক প্রথম বিধবা বিবাহকারী দম্পতী ছিল শ্রীশচন্দ্র ন্যায়রত্ন অ কালীমতি- যা উপন্যাসে

রয়েছে, কিন্তু ইতিহাসের সত্য হল- "...বিধবা বিবাহের প্রথম পাত্র হলেন খাটুয়া গ্রাম নিবাসী (২৪-পরগণা) বিখ্যাত কথক রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন"।[১৬]

'সেই সময়' উপন্যাসে উনিশ শতকের নগর কলকাতার সমাজচিত্র ঔপন্যাসিক অনুপুঙ্খ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর লেখার সময়টিকে এক জায়গায় 'ব্যাখ্যাহীন অস্থিরতা' বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ- "...সময়ের এক অস্থির রোহভূমিতে দাঁড়িয়ে লেখক ঊনবিংশ শতাব্দের মোচড় খাওয়া সময় সমাজ ও ব্যক্তি পাত্রের চলিষ্ণুতার বিরাট আলেখ্য এঁকেছেন 'সেই সময়' উপন্যাসে"।[১৭] উনিশ শতকের নবজাগরণের ফলে একদিকে বাবুরা বুলবুলির লড়াই, পানাসক্তি, গণিকা প্রতিপালনে ব্যস্ত ছিল, আবার- "...অন্য একদল নটীর নূপুরে আর মদের পেয়ালায় ডুব দিলেন না, চোখ খুলে সামনের দিকে তাকালেন, নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখলেন"।[১৮] তাই সমাজে ভাল ও মন্দের সংমিশ্রণে একটি সন্ধিক্ষণের উপস্থিত হয়েছিল। গণিকা প্রতিপালন সম্পর্কে বলা হয়েছে- "...ব্যায়ের ব্যাপারে রামকমল সিংহের কোন কার্পণ্য নেই। ...পাঁচজন লোক ডেকে নিজের রক্ষিতার নাচ দেখানো বসাতে হলে সকলেই বাঈজী ভাড়া করে আনে, নিজের মেয়ে মানুষকে রাখে আড়ালে"।[১৯] এই ছবির মাধ্যমে লেখক নগর কলকাতার ভগবিলাসিতার দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার জগমোহন সরকারের মতো ব্যক্তিরা সুনাম অর্জনের লোভে 'ফিমেল উদ্ধারের' নামে এগিয়ে আসে, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত রূপটি হল- "...ফিমেল উদ্ধারের নাম করে ভদ্দরলোকের বাড়িতে ঢুকে জাত কুল নষ্ট করচে। এক ব্রাহ্মণের বিধবা, একটি মাত্র ছোট মেয়ে আছে তেনার, সেই মেয়েকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনবার জন্য মেয়ের মায়ের সব্বোনাশ করে দিলে গো!"[২০] এর থেকেই বোঝা যায় যে সমাজ সংস্কারের নামে এমন দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষও সেই সমাজে বর্তমান ছিল।

একটি সমাজের উন্নতি নির্ভর করে তার অর্থনীতির উপর। তাই উনিশ শতকের নগরকেন্দ্রিক অর্থনীতির ছবি দেখাতে লেখক ভুলে যাননি। কলকাতার ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসঙ্গ ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। এই উপন্যাসেও আমরা দেখি দ্বারকানাথ ঠাকুর 'কার টেগোর কোম্পানি' গঠন করে রেশম, নীল, জাহাজ প্রভৃতির ব্যবসা করেছেন, কারণ- "ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের মধ্যে বাষ্পীয় যানের সাহায্যে ব্যাপক যাতায়াতের ব্যাবস্থা প্রবর্তনের জন্য দ্বারকানাথের সজীব আগ্রহ ছিল"।[২১] তাছারা- "উনিশ শতকে বাঙালীদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো স্বাধীন শিল্প বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহ ও অনুরাগ দ্বিতীয় আর কারও ছিল কিনা সন্দেহ"।[২২] বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারী প্রথাও প্রচলিত ছিল। দেশের অর্থনীতির বেশির ভাগটাই নির্ভর করত জমিদারী থেকে প্রাপ্ত করের উপর।

ইংরেজরা বাণিজ্যে অর্থনৈতিক মুনাফা লাভের খাতিরে শস্যশ্যামলা গ্রাম বাংলার চাষের জমিতে নীল চাষ করাতো এবং কোন কৃষকের কাছ থেকে নীল উৎপাদন কম হলে বিনিময়ে নীলকর সাহেবেরা নৃশংস অত্যাচারে জর্জরিত করত। উপন্যাসে আমরা দেখি যে জামালুদ্দিন ও তার স্ত্রী হানিফার উপর অত্যাচার সেই ইতিহাসেরই পরিচায়ক। নীল কুটির সাহেবেরা জোড় করে দাদন প্রদান করত চাষিদের। এই প্রসঙ্গে সংবাদ প্রভাকরে বলা হয়েছিল- "...যে প্রজা নীলের দাদন গ্রহণ করে তাহার উদরান্ন নির্ব্বাহ হওয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। এক পুরুষ দাদন লইলে তিন পুরুষ পর্যন্ত ক্রীতদাসের ন্যায় অবিশ্রান্ত রূপে পরিশ্রম করিলেও সেই দাদনের টাকা পরিশোধ হয়না...".[২৩] কিন্তু এই অত্যাচারের বার্তা জনসমক্ষে উপস্থাপন করলেন দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীলদর্পন' নাটকের মাধ্যমে। তাছাড়া হরিশচন্দ্র মুখার্জি নীলকরদের বিরুদ্ধে তাঁর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় নিয়মিত লিখেগেছেন। পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংখ্যায় নীলকরের অত্যাচারের দৃশ্য এইরূপ- "...Mr. Cockburn got angry, and ordered his men to use force, and then rode away

to his factory. The men advance killed one of the villagers, wounded two of them, plundered some houses and went away with about a hundred head of cattle."[২৪] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য উনিশ শতকে সমাজ সংস্কারের জন্য তথা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অনেক লড়াই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। তেমনই নীল চাষিদের দুরাবস্থার কথা ব্রিটিশ সরকারকে জানানোর উদ্দেশ্যে পাদ্রী লং সাহেব 'নীল দর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করলে তাঁর একমাস কারাদণ্ড ও এক হাজার তাকা জরিমানা হয়। তখন- "... জরিমানার হুকুম হইবামাত্র মহাভারতের অনুবাদক সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়, জরিমানার হাজার টাকা গুনিয়া দিলেন"[২৫] (উপন্যাসে নবীনকুমার সিংহ)।

উনিশ শতকের বিভিন্ন সমাজ সংস্কারের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ রদের মতো বিখ্যাত কয়েকটি কর্মে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। সমালোচকের মতে- "বিধবা-বিবাহ প্রচলন আন্দোলনই বিদ্যাসাগরের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত সমাজ-সংস্কার আন্দোলন"।[২৬] তিনি বিধবা বিবাহের সপক্ষে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় মত গঠন করে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করে জনজাগরণ করেছেন। রামমোহনের সতীদাহ রদ প্রথার ফলে সমাজে যে বালবিধবার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, বিধবা বিবাহের প্রচলনের ফলে তা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ভাবে দেখা দিল এবং সেই কারণেই বিদ্যাসাগর বঙ্গ নারীর কল্যানার্থে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভাবে বিধবা বিবাহ প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন। এখানে উল্লেখ্য যে প্রত্যেক বিধবা বিবাহে কালীপ্রসন্ন সিংহ ওরফে আলোচ্য উপন্যাসের নবীনকুমার সিংহ আর্থিক সাহায্য করতে লাগলেন। অপরদিকে বিধবা বিবাহের মতোই নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে এগিয়ে এলেন 'কাউন্সিল অব এডুকেশনের' সভাপতি বেথুন সাহেব। প্রতিষ্ঠিত হল বেথুন স্কুল অ অন্যান্য বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয়। মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর দুই মেয়েকে বেথুন স্কুলের প্রথম ছাত্রী করে পাঠালেন। তাছাড়া উপন্যাসের পটভূমির দিকে দৃষ্টি রেখে ঔপন্যাসিক সেই সমসাময়িক সমাজের ধর্ম সংস্কারের ছবিও অনুপুঙ্খ ভাবে এঁকেছেন। ধর্মীয় গোঁড়ামির মূলে কুঠারাঘাত করে অন্ধবিশ্বাসের চিতায় এক আলোকিত ও উন্নত বাঙালির ভিত গঠন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। গোঁড়া হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সেই সময়ে যে সকল সচেতন ব্যাক্তিরা মুখর হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যে রামমোহন রায় ছিলেন অন্যতম। উপন্যাসে লেখক বলেছেন- "... যে বেদশাস্ত্র ভূদেব ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন মনুষ্যের স্পর্শ করিবার অধিকার ছিল না, রামমোহন রায় তাহা মুদ্রিত করিয়া ম্লেচ্ছের হস্তে পর্যন্ত সমর্পণ করিলেন"।[২৭] রামমোহন রায় তৎকালীন সমাজের ধার্মিক অবক্ষয় রোধ করার জন্য যে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন পরবর্তীতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন ও একইসঙ্গে 'তত্ববোধিনী সভা'-র প্রতিষ্ঠা করলেন। তৎকালীন উনিশ শতকের বিদ্যোৎজনেরা বিভিন্ন পুস্তকের অনুবাদ কার্য তথা নতুন নতুন গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে সমাজকে এক নতুন পথের দিশারী করে তুলেছিলেন। ফলে সমাজে শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কিছু সংখ্যক লোকের উন্নতি সাধিত হল।

অবশেষে বলা যায় ইতিহাস হল একটি জীবন্ত সময়ের দলিল। সেই ইতিহাসের চর্চা যে যুগেই করা হোক না কেন, তা সর্বদা সত্যেরই পরিচায়ক হয়ে ওঠে। তাই 'সেই সময়' উপন্যাসের বিস্তৃত আলোচনা করলে দেখা যায় যে এই কাহিনি নিছক মাত্র জীবন বোধাতাত্মক ঘটনা দ্বারা সৃষ্ট সাধারণ কথাসাহিত্য নয়, উপরন্তু তা একটি নির্দিষ্ট সময়ের নির্ভেজাল ইতিহাসের নজির মাত্র। ইতিহাস ও সজীব উপন্যাস এখানে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে রয়েছে।এভাবেই ঔপন্যাসিক সহজ সরল ভাবে উনিশ শতকের কলকাতার ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে এই উপন্যাসকে 'একমেব অদ্বিতীয়ম' করে গড়ে তুলেছেন। এবং এখানেই 'সেই সময়' রচনাটি ইতিহাস ও উপন্যাসের এক অদ্ভুত যুগলবন্দী হয়ে উঠেছে।

সূত্রনির্দেশ:

(১) রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪২০, পৃষ্ঠা- ৬৮৭
(২) শ্রীশচন্দ্র দাশ – 'সাহিত্য-সন্দর্শন', প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৯৩
(৩) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় – 'সেই সময়', আনন্দ, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সং ১৩৯৮, চতুর্দশ মুদ্রণ ১৪২১, পৃষ্ঠা- ৭০৫
(৪) অরুনকুমার মুখোপাধ্যায় – 'কালের প্রতিমা'-বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর: ১৯২৩-১৯৯৭', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৪, পঞ্চম সং ২০১৬, পৃষ্ঠা- ২৭৩
(৫) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় – 'সেই সময়', আনন্দ, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সং ১৩৯৮, চতুর্দশ মুদ্রণ ১৪২১, পৃষ্ঠা- ২৮৫
(৬) তদেব, পৃষ্ঠা- ৭০৫
(৭) তদেব, পৃষ্ঠা- ১১১
(৮) তদেব, পৃষ্ঠা- ১১২
(৯) তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৭
(১০) স্বপন বসু – 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস', পুস্তক বিপনি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৫, পঞ্চম সং : ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৯৬
(১১) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় – 'সেই সময়', আনন্দ, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সং ১৩৯৮, চতুর্দশ মুদ্রণ ১৪২১, পৃষ্ঠা- ৩৩৭
(১২) তদেব, পৃষ্ঠা- ৭০৫
(১৩) তদেব, পৃষ্ঠা- ৭০৫
(১৪) https://en.m.wikipedia.org/wiki/kaliprasanna-singha
(১৫) সুশোভন সরকার – 'বাংলার রেনেসাঁস', দীপায়ন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৭, পঞ্চম সং : ২০১১, পৃষ্ঠা- ৬০
(১৬) বিনয় ঘোষ – 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা', প্রকাশ ভবন, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ : ২০০৯, পৃষ্ঠা- ২৮৯
(১৭) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় – 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬১, চতুর্থ সং : ২০০০, পৃষ্ঠা- ৩৪১
(১৮) স্বপন বসু – 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস', পুস্তক বিপনি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৫, পঞ্চম সং : ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৯৬
(১৯) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় – 'সেই সময়', আনন্দ, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সং ১৩৯৮, চতুর্দশ মুদ্রণ ১৪২১, পৃষ্ঠা- ৭৩
(২০) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭৪
(২১) কিশোরীচাঁদ মিত্র – 'দ্বারকানাথ ঠাকুর' সম্বোধি পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬২, পৃষ্ঠা- ৪৩

(২২) বিনয় ঘোষ – 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা', প্রকাশ ভবন, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ : ২০০৯, পৃষ্ঠা- ১০৬

(২৩) স্বপন বসু – 'সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ (প্রথম খণ্ড), পশিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০০, পৃষ্ঠা- ২৪২

(২৪) তদেব, পৃষ্ঠা- ২৪৩

(২৫) শিবনাথ শাস্ত্রী – 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা.লি., কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ১৯০৪, দ্বিতীয় সং: ২০০৭, তৃতীয় মুদ্রণ : ২০০৯, পৃষ্ঠা- ১৪৮

(২৬) বদরুদ্দীন উমর – 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ', চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৪ (ঢাকা, বাংলাদেশ), দ্বিতীয় ভারতীয় সং ১৯৮২, পঞ্চম মুদ্রণ ২০০১, পৃষ্ঠা- ৬০

(২৭) নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় – 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত', দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১২৮৮, দে'জ দ্বিতীয় সং ১৩৮১, পৃষ্ঠা- ৫১